স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি

ভগিনী নিবেদিতা

পাশ্চাত্য পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন

বৌদ্ধধর্মের প্রচারযুগের অবসান হইবার পর হইতে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর বেশে শিকাগো প্রদর্শনীর অন্তর্গত ধর্মমহাসভার মঞ্চে দণ্ডায়মান হন, সেদিন পর্যন্ত হিন্দুধর্ম নিজেকে প্রচারশীল ধর্ম বলিয়া ভাবে নাই। হিন্দুধর্মের শিক্ষকতা-কার্যই যাঁহাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল, সেই ব্রাহ্মণগণ ছিলেন নাগরিক ও গৃহস্থ এবং সেজন্য হিন্দুসমাজেরই এক অঙ্গস্বরূপ ছিলেন, ফলে সমুদ্রযাত্রার অধিকার হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। আর সিদ্ধপুরুষ বা অবতার পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ অপেক্ষা যতটা উচ্চে অবস্থিত, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত পরিব্রাজক সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চতম অধিকারী, প্রামাণ্য হিসাবে যদিও তাঁহাদের স্থান ব্রাহ্মণজাতি অপেক্ষা ঠিক ততটাই উচ্চে—তথাপি তাঁহারা স্বাধীনতার ঐ প্রকার ব্যবহারের কথা আদৌ ভাবিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দও নিজ বিশ্বস্ততাজ্ঞাপক কোন পরিচয়-পত্র লইয়া শিকাগোর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন নাই। যেমন তিনি ভারতের এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, ঠিক তেমনভাবেই তাঁহার মাদ্রাজের জনকয়েক অনুরাগী ও শ্রদ্ধাবান শিষ্যের আগ্রহে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে আগমন করেন। আমেরিকাবাসিগণও স্বজাতিসুলভ আতিথ্য ও সরলতাগুণে তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণপূর্বক বক্তৃতা দিবার সুযোগ দেন। যেমন বৌদ্ধপ্রচারকগণের ক্ষেত্রে, তেমন তাঁহার ক্ষেত্রেও এক মহাপুরুষের শক্তিই তাঁহাকে জোর করিয়া বিদেশে প্রেরণ করে—যে মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে বহু বৎসর বাস করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সঙ্গিস্বরূপ হইয়াছিলেন। তথাপি পাশ্চাত্যদেশে তিনি কোন বিশেষ আচার্যের কথা বলেন নাই, কোন এক সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ঘোষণা করেন নাই। "হিন্দুগণের ধর্ম-সম্বন্ধীয় ধারণাবলী"—ইহাই ছিল তাঁহার শিকাগো বক্তৃতার বিষয়; এবং ইহার পরেও, যে সকল তত্ত্ব বহু অংশে বিভক্ত সনাতন হিন্দুধর্মের সাধারণ সম্পত্তি এবং বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, কেবল সেইগুলিই তাঁহার বক্তৃতায় স্থান পাইত। সুতরাং ইতিহাসে এই প্রথম একজন অতি উচ্চদরের

মনীষাসম্পন্ন হিন্দু, অন্য সকল বিষয় পরিহারপূর্বক হিন্দুধর্মকেই বিশ্লেষণ ও উহার বিশ্লিষ্ট-অংশগুলির সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করিতে যত্নপর হন।

স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত আমেরিকায় অবস্থান করেন এবং তারপর প্রথমবার ইউরোপে আগমন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হন এবং প্রায় একমাস পরে লণ্ডনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

স্বামীজীকে যেরূপে দেখিয়াছি
ভগিনী নিবেদিতা

ভূমিকা :

'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থটি ভগিনী নিবেদিতার লেখা বিখ্যাত ও জনপ্রিয়তম গ্রন্থ 'The Master as I saw Him'-এর বঙ্গানুবাদ। যদিও বঙ্গানুবাদটি স্বয়ং লেখিকার নয়। উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস থেকে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস পর্যন্ত পূজণীয় স্বামী মাধবানন্দজী 'আচার্য শ্রী বিবেকানন্দ (যেমন দেখিয়াছি) নামে ধারাবাহিকভাবে উক্ত ইংরেজি গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। সেটিই পরবর্তীকালে ১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' নামকরণের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ২৬টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় পর্ব থেকে শুরু করে জীবনের প্রত্যেকটি শিক্ষা ধ্যান-ধারণাকে আপন উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন লেখিকা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গ্রন্থটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে জানিয়েছিলেন এই গ্রন্থের মাধ্যমেই স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তাঁর পূর্ণ পরিচয় ঘটে।

লেখিকা পরিচিতি :

স্বামী বিবেকানন্দের 'মহান ভারতবর্ষে'র স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার প্রধানতম কাণ্ডারী যাঁরা ছিলেন, নারীসিংহী সিস্টার নিবেদিতা তাঁদের অন্যতম। ভারত মাতার প্রসূতি না হয়েও তিনি ভারতমাতার কন্যারূপে, সকলের ভগিনী রূপে আমাদের সেবা করেছেন, আমাদের সকল দুঃখ আঁচল পেতে কুড়িয়েছেন। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার এক মহতী সিদ্ধি সেবাব্রতী লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদত্ত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। মেরি ইসাবেল এবং সিমুয়েল রিষমণ্ড নোব্‌ল-এর কন্যা মার্গারেট ছোটোবেলা থেকেই মানবসেবাব্রতের শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর পরিবারের কাছ থেকে। দশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি মামার বাড়ি চলে যান এবং লন্ডনের বোর্ডিং চার্চ স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে মার্গারেট সাহিত্য, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ সশস্ত্র আইরিশ বিপ্লবের সভানেত্রীরূপে মার্গারেট যখন দায়িত্বভার সামলাচ্ছিলেন সে সময় স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তাঁর প্রথম স্বাক্ষাৎ ঘটে। এরপর তাঁর

মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। যার ফলস্রুতি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে তিনি অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেন। স্বামীজীর দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে মার্গারেট হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। স্বামীজীর বক্তৃতা এবং লেখা চিঠিপত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষে আসেন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। একমাত্র লক্ষ্য ভারতের কল্যাণ ও সেবা। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি জাতীয়তাবোধের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগ ও সেবার ভাব নিয়ে তিনি ভারতে কাজ শুরু করলেন। তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেশের অত্যাচারিত ও অবহেলিত নারী সমাজের প্রতি। এদের শিক্ষাদেবার মানসে তিনি কোলকাতার বাগবাজারের নিকট বোসপাড়া লেনের একটি ভাড়াবাড়িতে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। প্রতিবেশী বালিকা ও বাল্যবিধবাদের নিয়ে পথচলা তাঁর বিদ্যালয় আজও সুনামের সঙ্গে তাঁরই পবিত্র নাম সঙ্গে নিয়ে মহাসমারোহে এগিয়ে চলেছে। শ্রীমায়ের আশীর্বাদ ধন্য সেই বিদ্যালয়ে আজও দেশের নারীকুল ভগিনী নিবেদিতা আদর্শে শিক্ষিত হয়ে চলেছে। তিনি নিজে স্কুলে ছাত্রীদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজের আচার-আচরণ, ভাষা-বেশভূষা, শিক্ষা, সংগীতের মধ্য দিয়েই তিনি ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ভাবটি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন।

শুধু শিক্ষাবিস্তারে নয়, আর্ত মানুষের সেবাতেও নিবেদিতা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। কলকাতার ভয়ংকর প্লেগ বিধ্বস্ত পল্লিতে তাঁকে নির্ভীক ও ক্লান্তিহীনভাবে সেবা করতে দেখা গিয়েছিল। বরিশালের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তাঁকে অন্নপূর্ণারূপে ত্রাণকার্যে পূর্ণ সহায়তা করতেও দেখেছি। নিজের জীবনের পরোয়া না করে, বারবার দুঃখী মানুষের মধ্যে ছুটে যাওয়াই প্রমাণ করে তাঁর মহত্ব। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, 'লোকমাতা' উপাধিটি তাই তাঁর সাথেই মানানসই হয়। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগরণের মূলমন্ত্র রোপণ করার কাজেও নিবেদিতা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর মুখে মন্ত্রের মতো নিত্য, উচ্চারিত হত 'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ'। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অপমানিত ভারতবাসীদের তিনি এতটাই আপন করে নিয়েছিলেন যে-কোনো সময়ই তাঁকে বিদেশিনী বলে মনে হয়না। সারদাদেবী তাই বলেছিলেন—"নিবেদিতা এখানকার, কেবল তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাব ও বার্তা ওদেশে প্রচারের জন্য ওদেশে জন্মগ্রহণ করেছিল।" কর্ম ও সেবার পাশাপাশি তাঁর কণ্ঠ ও লেখনীও সমান গতিতে ছুটেছিল। দেশের নানাস্থানে তিনি বক্তৃতা করেছেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে ভারতবাসী অনেক তথ্য জানতে পেরেছিল। তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ 'The Master as I saw him' নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গ্রন্থটি পড়ে বলেছিলেন— "ভারতবর্ষকে আমি ভালোবেসেছি বিবেকানন্দ পড়ে। আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়।" তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'দ্য ওয়েভ অফ ইন্ডিয়ান লাইফ', 'ক্রেডল টেলস অফ হিন্দুইজম', 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান হস্টার্ন হোম, 'সিভিল আইডিয়াল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিটি', 'হিন্টস অন ন্যাশানল এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া', 'গ্লিম্পসেস অফ ফেমিন অ্যান্ড ফ্লাড ইন

ইস্ট বেঙ্গাল' ইত্যাদি। কর্তব্য নিষ্ঠায় প্রতিভার দীপ্তিতে; নেতৃত্বদানে তিনি ছিলেন অনন্যা। জীবনে সফলতা লাভ করার উপায় হিসাবে তিনি সর্বদা জোর দিতেন উন্নততর মনোসংযোগ, ক্রোধ সংবরণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইতিবাচক চিন্তন, মনের একাগ্রতা, সুগভীর প্রত্যয় এবং সকলের সঙ্গে চলতে পারার মানসিকতার ওপর। তাঁর আপাত করুণারূপের অন্তরালে ছিল তেজোদৃপ্ত মহিমাময়ী মূর্তি।

ভারতবর্ষের কল্যাণকামী এই মহীয়সী রমণী মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে দার্জিলিং শহরে পরলোকগমন করেন। কিন্তু মানুষের মনে তিনি বেঁচে আছেন আজও ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবেন আশা রাখি।

স্বামীজী কিন্তু পরমানন্দও লাভ করেছিলেন এসময়।

প্রঃ 'স্বামীজীকে যেরূপে দেখিয়াছি' গ্রন্থে নিবেদিতার দৃষ্টিতে সারদাদেবীর পরিচয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার বর্ণনা দাও।

উঃ ভগিনী নিবেদিতা লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Master as I saw him'-এর স্বামী মাধবানন্দকৃত বঙ্গানুবাদ 'স্বামীজীকে সেরূপে দেখিয়াছি'। এই গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে 'কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত পরিবার' শিরোণামাঙ্কৃত অংশেই আমরা সারদাদেবীর পরিচয় লিপিবদ্ধ হতে দেখেছি। দেশ থেকে কলকাতায় আসার পর সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এবং তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুবাদে যে অভিজ্ঞতা নিবেদিতা লাভ করেছিলেন তার বিবরণ তিনি এখানে দিয়েছেন। অপরিচিতা রমণী থেকে দয়াময়ী জননী হয়ে নিবেদিতাকে যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন সারদাদেবী, কন্যার ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তাই চিত্রায়িত করেছেন এই অধ্যায়ে।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় আসার পর বাসস্থান নিয়ে প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নিবেদিতাকে। স্বামীজী সেকথা শোনার পর সারদাদেবীর কলকাতার বাসভবনে নিবেদিতার থাকার ব্যবস্থা করে দেন। নিবেদিতার কথায়—"শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী 'সারদাদেবী' অথবা ভক্তগণের পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী মাতাঠাকুরাণী স্ত্রীভক্তগণসহ নিকটে বাস করিতেন। সেইদিনই আমি তাঁহার নিকট একটি কক্ষে বাস করিবার অনুমতি লাভ করি।" এই ঘটনাটিকে তিনি 'বিধাতার কৃপা' বলে বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের জাতিভেদ, কুসংস্কার, বিদেশিনীর প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি প্রভৃতি এত বেশিমাত্রায় ছিল যে, নিবেদিতার পক্ষে কলকাতায় বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠত যদি না সারদাদেবী আশ্রয়দাত্রী হয়ে উঠতেন। তিনি অন্য সবার সাথে একসঙ্গেই শোয়াবসা করতেন। পালিশ করা লাল মেঝের উপর সারি সারি বিছানো মাদুরে এক একটি বালিশ ও মশারি বরাদ্দ ছিল সারদাদেবীর আশ্রয়ে থাকা নারীদের জন্য।

নিজের জীবনে সারদাদেবী ছিল অনুকরণীয়া এমন একজন মানুষ যাঁর শীতল ছায়ায় প্রশান্তি লাভ করা যেত। অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন তিনি। পাঁচ বছর বয়সে

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলেও দাম্পত্য জীবনযাপন করা তাঁদের হয়নি। পত্নীভাবে নয় সারদাদেবী শিষ্যাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং থেকেছিলেনও আজীবন— "তখন হইতে সেই উদ্যানেরই একটি গৃহে বহু বৎসর তিনি স্বামীর নিকট পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় বাস করেন। একাধারে ধর্মপত্নী ও সন্ন্যাসিনী, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শিক্ষা দিলেও কখনো কখনো অবুঝ বালিকা হৃদয় কান্নাকাটি করলে ঠাকুর তা সহ্য করতে পারতেন না। শিষ্যদের তিনি বলতেন "ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বর ভক্তি পর্যন্ত উড়ে যাবে।"

সারদাদেবী সর্বদাই রামকৃষ্ণদেব অর্থাৎ নিজের স্বামীকে 'গুরুদেব', 'শ্রীগুরু' প্রভৃতি সম্বোধন করতেন। নিজের পত্নীর অধিকারকে কখনো সামনে আনেননি। একবার যখন নিজেকে তাঁর শিষ্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন তখন মনে মনে সেই ভাবটিই তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। নিবেদিতা তাই তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন এই বলে— "তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী।" সাধারণ হয়েও তিনি অসাধারণ। তাঁর জ্ঞান, মাধুর্য, শিষ্ঠতা, আভিজাত্য, উদার হৃদয়, দেবীত্ব, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতা, অসহায় নারীর সম্মানের প্রতি কঠোর দৃষ্টি, কোমল ও কৌতুক পূর্ণ মন তাঁকে অসাধারণ করে তুলেছিল। দীর্ঘকাল ধরে সংসার পরিচালনা, ঈশ্বরভক্তি, তীর্থস্থান ভ্রমণে অভিজ্ঞতার যে ভাণ্ডার তাঁর মধ্যে সঞ্চয় হয়েছিল তাতেই তিনি মহৎ এবং সর্বগুনান্বিত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিনেও শ্রীশ্রীমা ছিলেন একই রকম সচল। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন পূজা শ্রীশ্রীমায়ের হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়েছিল। পূজা শেষে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে মায়ের আশীর্বাণী ছিল— "যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগমাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।" মায়ের সেই আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে মিলতে দেখে তাঁর প্রতি নিবেদিতার ভক্তি শ্রদ্ধার মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বর্তমানেও সেই বালিকা বিদ্যালয় মায়ের আশীর্বাদধন্য হয়ে নিজেদেরকে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সারদাদেবীর সংস্পর্শে নিবেদিতা ধন্য হয়েছেন, তাঁর হৃদয় ভরে গেছে। গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে সারদাদেবীর কথা বর্ণনায় সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তির বহিঃপ্রকাশই দেখি আমরা।

প্রঃ স্বামীজীর মহাপ্রস্থান সম্পর্কে আলোচনা করো।

উঃ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর মহামানবের 'মহাসমাধির বিবরণ নিবেদিতা লিপিবন্ধ করেছিলেন তাঁর 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থের ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদে। আমরা জানি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই স্বামীজী বেলুড় মঠের বাসগৃহে ধ্যানস্থ অবস্থায় সমাধিস্থ হন। কিন্তু অনেক আগে থেকেই তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর বছর দুই আগে মিশর ভ্রমণ করার মাঝপথে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। শেষ কয়েক বছর ধ্যান এবং তপস্যা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মিশরে ভ্রমণকালে পিরামিড, নারীমুখ বিশিষ্ট সিংহমূর্তি দেখে— "তিনি যেন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি

অভিজ্ঞতারূপ মহাগ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতেছেন। ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ আর তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না।"

মিশরে স্বামীজীর ভ্রমণসঙ্গী ফরাসি নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি কালভের বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্বামীজী লিখেছিলেন— "The force of association makes out of this unreal world a reality; and the longer the company, the more real seems the shadow. But the day comes when the unreal goes to the unreal. Yet that which is real, the soul, is ever with us, omnipresent. Blessed is the person who has seen the real in this world of vanishing shadows" কথাগুলি বোধ হয় তাঁর জন্যেও সত্যি। নিজের মৃত্যুর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছিলেন বোধহয়। শারীরিক অসুস্থতাকে সঙ্গী করে মৃত্যুর মাস কয়েক আগে তিনি শেষবারের মতো ভ্রমণ করেছিলেন বুদ্ধগয়া, বারানসী, কাশীধাম প্রভৃতি অঞ্চল। সেখান থেকে বেলুড়ে ফিরে স্বদেশী ও বিদেশী ভক্তগণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, বিদায় সম্ভাষণ পর্বের মধ্যে দিয়েই চলেছিল শেষ দিনটির প্রস্তুতিপর্ব। জুলাই মাসের বুধবার মৃত্যুর ঠিক দুদিন আগে একাদশী তিথিতে তিনি নিজের হাতে শিষ্যকে পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন কাঁঠালের দানা সেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, সাদা ভাত এবং বরফ দিয়ে ঠান্ডা করা দুধ। খাবার শেষে নিজেই তাঁর হাত ধুইয়ে এবং মুছিয়ে দিলেন। শিষ্য মৃদু প্রতিবাদ করে একাজগুলির জন্য অস্বস্তি প্রকাশ করে যখন স্বামীজীর কাছে জানতে চাইলো তিনি এগুলো কেন করছেন তখন স্বামীজী জানিয়েছিলেন— "ঈশা তাঁর শিষ্যের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।" উত্তরে শিষ্যের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল "সে তো শেষ সময়ে।" কথাটি শুনে স্বামীজী হেসে উঠেছিলেন।

অবশেষে ৪ জুলাই, ১৯০২, শুক্রবার। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর নিত্যনৈমিত্তিক ধ্যান করার পর হাসিমুখে গুরুভাইদের সঙ্গে ফল এবং গরম দুধ খেলেন স্বামীজী। আগের কয়েকটা দিনের তুলনায় তাঁকে একটু বেশি প্রাণবন্ত এবং সবল দেখাচ্ছিল সেদিন। তাই বোধহয় নিবেদিতার কাছে— "দিনটিকে মনে হইয়াছিল আনন্দময়।" বেলার দিকে স্বামীজীর কণ্ঠে শোনা গেল শ্যামা মায়ের গান— "মা কি আমার কালো/ কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো।" গুরুভাইদের সঙ্গে বসে ইলিশ মাছের পদ দিয়ে ভাত খাওয়ার পর পড়াশোনা করলেন স্বামীজী। বিকেলবেলা গুরুভাই প্রেমানন্দকে নিয়ে বেলুড় বাজার পর্যন্ত হেঁটে এসে মূলমঠে সন্ধ্যারতি দেখে চলে গেলেন নিজের ঘরে। সঙ্গে তরুণ ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র মহারাজ। তারপর পবিত্র গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যানে বসলেন। বাকিটুকু লেখিকার উক্তিতে— "ইহাই শেষ ধ্যান। অতঃপর প্রথম হইতে যে মুহূর্তের কথা তাঁহার গুরুদেব ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, সেই শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইল। আধঘন্টা কাটিয়া গেল, তারপর সেই ধ্যানরূপ পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার আত্মা দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া পরমধামে চলিয়া গেল— সেখান হইতে আর পুনরাবর্তন ঘটে না, শরীরটা ভাঁজ করা পোশাকের মতো পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।" বাঙালি জীবনের দুঃখের মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল এইসময়। বিশ্বজয়ী বীর বিবেকানন্দের মহাসমাধি হল বেলুড়মঠে। ভক্ত শিষ্যা নিবেদিতা যার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গুরুদেব কেন্দ্রিক গ্রন্থে।